কবর

(১)

সুমিত্রা আমার আশৈশবের বন্ধু। এমন বিপরীত স্বভাবের মেয়েটার সঙ্গে কি করে যে আমার বন্ধুত্ব হ'ল এবং সে বন্ধুত্ব আজীবন টিঁকে রইল ভাবলে অবাক লাগে। ছোটবেলায়, এমন কি বড় হয়েও, ওর জন্যে কম নাজেহাল হ'তে হয়নি আমায়। অথচ তবু, বন্ধুদের মধ্যে ওই আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। সুখ বা স্বস্তিতে থাকা ভগবান ওর কপালে লেখেন নি। ক্লিওপ্যাট্রা সম্বন্ধে কে যেন বলেছিল যে ভদ্রমহিলার নাকটা যদি একটু বোঁচা হ'ত তাহ'লে সে যুগের ইতিহাস বদলে যেত। সুমির বিষয়েও এই ধরণের একটা কিছু বলা চলে। মেয়েটা নিজের আগুনেই জ্বলে পুড়ে খাক হল সারাজীবন। পুড়িয়ে মারলো অন্যদেরও।

কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে সুমিত্রা ও আমি দু'জনে দু'দিকে ছিট্‌কে গেলাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। বাবা চাকরি থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অনেকখানি ভার এসে পড়লো আমার কাঁধে। ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া শেষ হ'তে তখনও কয়েকবছর বাকি। বাধ্য হয়ে একটা স্কুলে কাজ নিলাম। সেই সঙ্গে প্রাইভেটে এম.এ. পড়তে লাগলাম। এম.এ. পাশ করার পর একটা কলেজে কাজ জুটলো। চাকরির সঙ্গে পড়াশোনাও চালিয়ে গেলাম। কয়েক বছরের চেষ্টায় পি.এইচ.ডি. টাও হয়ে গেল। এবার পাটনা ইউনিভার্সিটিতে কাজ পেলাম। সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হ'ল। ভাই দু'টো চাকরিতে ঢুকেছে। ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে। এতদিনে নির্ঝঞ্ঝাট আমি।

সুমিত্রার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে কয়েক বছরের ব্যবধানে ঘটনাচক্রে দেখাও হয়ে গেছে নিয়মিত ভাবে। ছোটবেলা থেকে সুমি তার সব গোপন কথার confidante করেছিল আমায়। বড় হয়েও এ অভ্যাসটি তার বদলায় নি। আমি তাকে পরিপূর্ণভাবে

জানতাম, যতটা পরিপূর্ণভাবে একজন বন্ধুকে জানা সম্ভব। সুমিত্রা তার বাবামা'র একমাত্র সন্তান। দেখতে শুনতে ভালো, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতো, বড়লোকের মেয়ে। সবকিছু মিলিয়ে লোকের মনোযোগটা একটু বেশীমাত্রায় জুটতো তার ভাগে। এক কথায় সাদা বাংলায় যাকে বলে আদর দিয়ে মাথা খাওয়া। বাড়িতে, স্কুল-কলেজে ও বাইরে সবাই মিলে আদর দিয়ে দিয়ে সুমির কচি মাথাটা বেশ ভাল করে চিবিয়ে খেয়েছিল।

(২)

কখনো কখনো কত তুচ্ছ ঘটনাও আজীবন মনে গাঁথা হয়ে থাকে। তখন সুমিত্রার বয়স বছর পনেরো। মাঝরাতে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল তার। টুকরো টুকরো কয়েকটা কথাই মনে ছিল। একটা চূণবালি খসা দোতলা বাড়ি ---- সব কিছু যেন বিষাদে ম্লান হয়ে আছে। বিষাদভরা দু'চোখ তুলে কে যেন ওকে বললো, "তুমিই আমার জীবনের সব আনন্দ মুছে দিলে ----।" ঘুমভাঙার পরও অনেকক্ষণ মনটা খারাপ হয়ে রইলো তার। অনেক বছর পর এই ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়েছিল পাটনায় মিঠাপুরে ললিতপ্রসাদের বাড়ি গিয়ে। প্রথম দিনেই কেমন যেন পরিচিত মনে হয়েছিল সবকিছু আর চকিতে ছোটবেলার সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সুমিত্রার।

সেটা অবশ্য বেশ ক'বছর পরের কথা। ততদিনে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে সে। লেখাপড়ায় আরও অনেক কৃতীত্ব দেখিয়েছে, প্রশংসা ও স্তুতি কুড়িয়েছে সর্বত্র। কিন্তু ক্রমাগত সন্দেশ খেতে খেতে যেমন মুখ মেরে যায়, অবিমিশ্র সুখও বোধহয় একঘেয়ে হয়ে আসে একসময়। নেহাৎ মুখ বদলানোর খাতিরেই বুঝি মনের অবচেতন থেকে চাহিদা আসে নতুন কিছুর। সুমিত্রার নিরবিচ্ছিন্ন সুখ শান্তিভরা জীবনে মূর্তিমান প্রলয়ের মত আবির্ভূত হ'ল রন্‌কা, অর্থাৎ রঞ্জন। সেবার গরমের ছুটিতে বাবামা'র সঙ্গে রাঁচীতে বেড়াতে গিয়েছিল। উঠেছিল প্রতুলকাকার বাড়ি। প্রতুলকাকা সুমিত্রার বাবার খুড়তুতো ভাই। তাঁর ছোটভাই রঞ্জন শিবপুরে ইন্জিনীয়ারিং পড়ে, ছুটিতে দাদার কাছে এসেছে। সম্পর্কে কাকা হ'লেও বয়সে সুমিত্রার থেকে মাত্র বছর পাঁচেকের বড়। ছুটির দেড়টা মাস যেন স্বপ্নের মত কেটে গেল। সুমিত্রারা ছাপরায় ফিরে যাবে এবার, রঞ্জনেরও ছুটি ফুরিয়ে এসেছে।

বিকেলবেলা বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাঁটছিল সুমিত্রা। রঞ্জন কোথা থেকে এসে ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। কারও মুখে কথা নেই। মেন রোড ছেড়ে কখন মেঠো রাস্তা ধরেছে ওরা। খানিকটা এগিয়ে একটা বটগাছ। তার তলায় হাত দুয়েক উঁচু ছোট্ট মন্দিরের মত। সামনেটা শিক দিয়ে ঘেরা। সেটা ভগবানের নিরাপত্তার জন্যে কিংবা ভক্তদের দেওয়া সিকি-আধুলি গুলোর হেফাজতের জন্যে তা বলা মুস্কিল। সামনে টিম টিম করে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। দেয়াল ও গাছের গুঁড়িতে সিঁদুরের গাঢ় প্রলেপ। গাছের চারিপাশ সিমেন্ট বাঁধানো। ওরা ওখানে গিয়ে বসলো। রঞ্জনের মুখটা অদ্ভুত গম্ভীর দেখাচ্ছে আজ। একটু ক্লিষ্টও।

"এটা শিব মন্দির ----- ভীষণ নাকি জাগ্রত ---। তোমার কোন মনোবাসনা থাকলে ঠাকুরকে জানাতে পারো।"

একটু বিদ্রুপের মত শোনালো রঞ্জনের গলা। সুমিত্রা দু'হাত জোড় করে চোখ বুঁজলো। ওর ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠলো। চোখ খুলে দেখে রঞ্জন অপলক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

"কি আবেদন জানালে শুনতে পারি?" রঞ্জনের চেষ্টাকৃত পরিহাস তার কণ্ঠের কাতরতা ঢাকতে পারলো না। "আমি হ'লে কি চাইতাম জানো সুমি?"

সুমিত্রার অবাধ্য হৃদয় কোলাহল করে উঠলো। সে রঞ্জনের মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলেই তখনি চোখ নীচু করলো। উঠে দাঁড়ালো রঞ্জন। সুমিত্রার সামনে এসে দুই হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরলো।

ওর চোখে চোখ রেখে চাপা গলায় বললো, "আমি হ'লে চাইতাম তোমাকে।"

(৩)

এরপর দু'বছর কেটে গেছে। ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েছে সুমিত্রা। কলেজে ভর্তি হয়েছে, হস্টেলে থাকে। তার কালো স্টীলের ট্রাঙ্কে সযত্নে রাখা আছে রাঁচীতে তোলা একটি গ্রুপ ফটো। সে ফটোতে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে রনকাও আছে। ইতিমধ্যে আরও দু'বার দেখা হয়েছে রঞ্জনের সঙ্গে। সেই সন্ধ্যাটি অম্লান হয়ে আছে ওর জীবনে। ভীরু হাতে

পোঁতা ক্ষীণ চারাগাছটি কিশোরী মনের আবেগ ও কল্পনার রসে সিঞ্চিত হয়ে ক্রমে সতেজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

আরও বছরখানেক পরের কথা। ছোটপিসির বিয়ে উপলক্ষ্যে সুমিত্রা তার বাবামা'র সঙ্গে কোলকাতায় এসেছে। বিয়ে বাড়ির কর্মব্যস্ততার মধ্যে রঞ্জনকে দেখলো সুমিত্রা। রঞ্জন কোলকাতার একটা বিদেশী ফার্মে কাজ করছে। এই ক'বছরে অনেকখানি গম্ভীর হয়েছে সে, অনেকটা ভারিক্কী। বোধহয় একটু মোটাও। বিয়েবাড়ির অনেকখানি দায়দায়িত্ব ওর কাঁধে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন গুরুজনরা।

সব কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে মিটে গেল। সুমিত্রার বাবা মা আরও দিন দশেক থেকে যাবেন। সুমিত্রা হঠাৎ বেঁকে বসলো ও আর একটি দিনও এখানে থাকবে না। অনেকগুলো লেকচার মিস হয়েছে, আর কলেজ কামাই করতে চায় না সে। অগত্যা ঠিক হ'ল ও একাই পাটনা ফিরে যাবে। ট্রেন বদলের ঝক্কি নেই। হাওড়ায় তুলে দিলে অনায়াসে পাটনায় নেমে যেতে পারবে। স্টেশন থেকে রিক্সা করে হস্টেলে যাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়।

হাওড়াতে সুমিত্রাকে ট্রেনে তুলে দিতে বাবা এলেন। শেষ মুহূর্তে রঞ্জনও ওদের সঙ্গে এলো। ওর জিনিসপত্র কুলিকে দিয়ে ঠিকঠাক করে রাখালো। বেডিং খুলে বিছানা পেতে দিলো। তারপর প্ল্যাটফর্মে ওর জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো। বুক ঠেলে কান্না আসছিল সুমিত্রার। গত ক'দিন কি ভাবে যে কেটেছে তার সেই জানে। যতবার রঞ্জনের সামনে এসেছে কিংবা তার গলা শুনেছে বুকের মাঝে তোলপাড় করে উঠেছে সুমিত্রার। ও কত প্রতীক্ষা করেছে এই বুঝি রঞ্জন একটুখানি হাসি ও চাউনি দিয়ে ছুঁয়ে যাবে ওকে। স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু রঞ্জন যেন ওকে চিনতেই পারেনি এ ক'দিন ----।

বাবা বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বই কিনছেন। রঞ্জন সে দিকে দেখে নিয়ে চকিতে সুমিত্রার মুখের পানে চাইলো। পরমুহূর্তে জানলার গরাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

বিষন্ন মৃদু গলায় বললো, "সুমি, নিয়তির সঙ্গে লড়াই করে কোনদিন জিততে পারে না কেউ। তার চেয়ে সমাজের বিধি নিষেধগুলোই মেনে নেওয়া ভাল তা সে যতই নিষ্ঠুর হোক। কারণ সমাজেই বাঁচতে হ'বে আমাদের -----।"

সুমিত্রা বলতে চাইলো, "আমি বাঁচতে চাইনা রন্‌কা, এভাবে আমি বাঁচতে চাইনা। তার চেয়ে এসো আমরা দু'জনে একসঙ্গে মরে যাই ----।" কিন্তু তার গলা বুঁজে আসছিল। হুইসিল বাজলো। বাবা দ্রুত পায়ে জানলার কাছে এগিয়ে এলেন। ট্রেনে নিরাপত্তার সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ নির্দেশ দিলেন। একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো। ছবির মত স্তব্ধ অনড় হয়ে বসে রইলো সুমিত্রা ।

এর মাস দুয়েকের পরই রঞ্জনের বিয়ের খবর পেয়েছিল সে। সুমিত্রার জীবনে এই প্রথম ও চরম পরাজয়। রঞ্জন হয়তো মঙ্গলের পথটাই বেছে নিয়েছে। তবু মাথা ঠাণ্ডা করে শুভাশুভ বিচারের অবস্থায় যে একমাত্র রঞ্জনই ফিরে এসেছে, সুমিত্রা নয়, এই অপমানের জ্বালা ভুলতে অনেকদিন লেগেছিল তার। এ ছাড়া রঞ্জন সম্বন্ধে দুর্বলতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। প্রেম খানিকটা নেশার মত। ধরা সহজ, ছাড়া কঠিন। এতদিন ধরে কল্পনার জাল বুনে চলেছিল অবিরত। এখন দেখলো ইচ্ছে করলেও তার থেকে মুক্ত হ'তে পারছে না সে। মাকড়সার জালের মত সে জাল ছিন্ন হয়েও লেপটে থাকছে তাকে ঘিরে।

(৪)

নিজের মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি সুমিত্রা। পৃথিবীতে কত দুঃসহ শোকতাপ কাটিয়েও আবার উঠে দাঁড়ায় মানুষ। সে তুলনায় সুমিত্রার ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু? আত্মীয় পরিজনের ভিড়ে টুকরো টুকরো কয়েকটি মুহূর্ত, সাদামাটা ঘরোয়া কথাবার্তার মাঝে দু'টি চোখের নরম উত্তাপের পরশ। এরই ভিতের উপর কল্পনার যে স্বর্গ বানাতে চেয়েছিল তা স্বাভাবিক নিয়মেই বুদ্বুদের মত নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। যা ছিল না, তা রইল না। শুধু এই দুই না থাকার মাঝে উত্তাল ঘটে গেল সুমিত্রা নামে একটি মেয়ের জীবনে। ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিল। শত্রু ব্যুহ ভেদ করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে এক যোদ্ধা। দুশমনের

তরোয়ালের এক ঘায়ে মাথা কেটে গেল, তবুও তীর বেগে ছুটে চলেছে মুণ্ডহীন বীর। নিজেকে সেই নাম-না-জানা ছিন্ন শির সৈনিকের মত মনে হ'ত সুমিত্রার। সব কিছুই আগের মত চলতে থাকে অথচ কোন কিছুই আর আগের মত নেই। সুমিত্রা কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সিনেমা দেখে, আড্ডা দেয়। অনুভূতিহীন ব্যস্ততা দিয়ে ঘিরে রাখে নিজেকে।

এরই মাঝে আলাপ হ'ল ললিতপ্রসাদের সঙ্গে। একই টিউটোরিয়াল গ্রুপে দু'জনে। এই আনন্দোজ্জ্বল কৌতুকপ্রিয় ছেলেটি ওদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের প্রাণ, সবার স্নেহ সৌহার্দ্যের পাত্র। সুমিত্রার প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ওর বন্ধুরা শুরু থেকেই লক্ষ্য করে এসেছে, এ নিয়ে ঠাট্টাও করেছে অনেকে। সুমিত্রা সম্রাজ্ঞীর মত অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছে ললিতপ্রসাদের একনিষ্ঠ আনুগত্য।

একটু একটু করে পরিচয় ঘনিষ্টতর হয়েছে। ললিতপ্রসাদ যেদিন ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল যে বি.এ.তে সে কোন সাবজেক্টে অনার্স নেবে, বি.এ. পাশ করে ল' পড়বে না এম.এ পড়বে এ সব ব্যাপারগুলো গত ক'বছর ধরে সুমিত্রাই তার নিজের অজ্ঞাতসারে মীমাংসা করে আসছে, ও শুধুমাত্র সুমিত্রাকে অনুসরণ করে ফিরেছে নির্বিচারে, সুমিত্রা লজ্জারুণ মুখে চোখ ফিরিয়ে নিলেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছিল ওর মনে। সে জানতো ললিতপ্রসাদের মুগ্ধ দৃষ্টি গত ছ'বছর ধরে ওকে অনুসরণ করে এসেছে দিনের পর দিন। আজীবন স্তুতি ও প্রশংসায় অভ্যস্ত সুমিত্রা এতদিন এটা পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু রঞ্জনের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার পর ললিতের নিষ্ঠা ওর কাছে চন্দনের প্রলেপের মত কাজ করলো। অবশ্য ওর তরফ থেকে বলা যেতে পারে যে ও জেনেশুনে ললিতপ্রসাদকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করে নি কোনদিন। কোনরকম স্বীকৃতি বা প্রতিশ্রুতি, ঠিক সেই অর্থে, কোনদিন দেয়নি।

ললিতপ্রসাদকে ওর ভাল লাগতো। একবার কি একটা উপলক্ষ্যে ললিত ওকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে ও যেতে দ্বিরুক্তি করেনি। ওদের বাড়িতে পা দিয়েই অদ্ভুত একটা আবেশে ভরে উঠেছিল মন। ললিতের মা সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন ওকে। দুই বৌদি সযত্নে পাশে বসালো। ছোট ছোট ক'টি ছেলেমেয়ে কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

সবাই যেন কত পরিচিত, কত আপনার। এ বাড়িতে যেন বহুদিন আগে কবে এসেছিল সুমিত্রা। মনে করতে গিয়ে চকিতে মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগের সেই স্বপ্নটার কথা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বাড়িটাই তো ! চমকে উঠে সামনে তাকাতেই ললিতপ্রসাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এক দৃষ্টে ওরই পানে চেয়ে রয়েছে সে ----।

এরপর সে বাড়িতে বহুবার গেছে সুমিত্রা । ললিতপ্রসাদ যেন উপলক্ষ্য মাত্র। সে না থাকলেও বুঝি সুমিত্রা ওই স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যেতো বারে বারে। স্নেহ মমতার রসদ সঞ্চয় করে আনতো আঁচল ভরে।

ললিতপ্রসাদ ও সুমিত্রা দু'জনেই তখন এম.এ. পাশ করে গেছে। পাটনায় দু'টি প্রাইভেট কলেজে কাজ করে ওরা। সুমিত্রা বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে, আর ললিতপ্রসাদ স্বপ্ন দেখছে সুমিত্রাকে ঘিরে। কলেজের অবকাশে লাইব্রেরীতে বইপত্তর ঘাঁটে, ছুটির দিনে ললিতপ্রসাদের সঙ্গে ওদের বাড়ি চলে আসে। ললিতপ্রসাদ যে সুমিত্রার এই আসাযাওয়া মেলামেশার কি অর্থ ভেবে নিয়েছে সেটা জেনেও সুমিত্রা বাধা দেয়নি কোনদিন। আসলে নিজের মন তখন নিজেই জানেনা সে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো কিছুতেই ভুলতে পারে না। কারণে অকারণে পুরোনো ক্ষতটা সবুজ হয়ে ওঠে আবার। ঠিক এই সময় কমনওয়েল্থ্ স্কলারশিপটা জুটে গেল। মনস্থির করার দায়িত্ব না হোক অন্তত তার পরিণামটা মুলতুবী রইলো আপাতত।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কি যেন একটা পরিবর্তন এলো সুমিত্রার মধ্যে। রঞ্জন হাজার হাজার মাইল দূরে তখন, ললিতপ্রসাদও। একাকীত্বের নিভৃতে নিজের মনের আবরণ সরিয়ে দেখলো সেখানে শুধু শুন্যতা, শুধু হাহাকার। সে শুন্যতার ভার আর যেন বইতে পারে না সুমিত্রা। ললিতপ্রসাদের চিঠি এলে তৃষিতের মত বারে বারে পড়ে। ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরতে চায় ওর নিঃসীম ভালবাসার অবলম্বনটুকু। সাগরের এপার থেকে স্বপ্নের জাল বুনে পাঠায় ললিতপ্রসাদ, সুমিত্রা তাই দিয়ে নিজের ভেঙে যাওয়া কল্পসৌধকে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। ওর মনে নতুন পুরোনো সব একাকার হয়ে গেছে তখন। চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া যেন নেশার মত ঘিরে ধরে ওকে।

(৫)

তিন বছর কেটে গেল। পড়াশোনা শেষ হয়েছে। দেশে ফেরার আগে এ দেশটা একটু ভাল করে ঘুরে দেখতে চায় সে। সেদিন শনিবার। সারারাত ধরে বরফ পড়েছে। জানলার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আনমনে বসে আছে সুমিত্রা। সোমবার লণ্ডন যাচ্ছে। সেখানে ক'দিন কাটিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার যাবে। তারপর এডিনবরা। ফায়ারপ্লেসে গ্যাসের আগুন জ্বলছে। ছোট্ট ঘরখানা বেশ গরম হয়ে আছে। ঘরের বাইরে পা দিলেই হাড় কাঁপানো শীত, ওভারকোট পুলোভারের পাহাড় সত্ত্বেও।

বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামলো। অন্য বাসিন্দাদের কারো ভিজিটর ভেবে গা করলো না সুমিত্রা। কয়েক মিনিট পরে দরজায় টোকা পড়লো। গরম ড্রেসিং গাউনটা ভাল করে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। দরজা খুলতেই দেখে ট্যাক্সি থেকে নামা সেই আগন্তুক। ওর চোখে মুখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ের রেশ ফুটেই মিলিয়ে গেল। তার বদলে আর্ত বেদনা ফুটে উঠলো সেখানে। ফ্যাকাসে মুখে অতিকষ্টে উচ্চারণ করলো, "রন্‌কা!" রঞ্জন ঘরের ভিতর ঢুকে ব্যাগটা মাটিতে রাখলো। দু'জনে অপলক চোখে চেয়ে থাকে দু'জনের দিকে। হৃৎপিণ্ডের মাঝে যেন ধারালো ছুরি বসালো কেউ। অতীত ভবিষ্যৎ সব কেটে কুটে তছনছ করে দিলো এক উন্মাদ কালপুরুষ। সুমিত্রাকে দু'হাতে বুকে টেনে নেয় রঞ্জন। নিজের মুখটা বার বার ওর মাথায় ঘষতে থাকে। সুমিত্রার চোখের জলে রঞ্জনের কোটের সামনেটা ভিজে যায়। ম্যাণ্টলপীসের উপর রাখা ললিতপ্রসাদের ফটোটা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওদের দিকে।

(৬)

রাত্রি নেমে এসেছে সবুজ পর্দা ঘেরা ছোট ঘরখানায়। ঘরের এক কোনে গ্যাস বার্নারটায় ফ্রাইংপ্যানে সসেজ ভাজছে সুমিত্রা, চোখে মুখে অস্বাভাবিক একাগ্রতা ফুটিয়ে। ওর পাশে কার্পেটের উপর হাঁটুগেড়ে অন্যমনস্কভাবে বসে আছে রঞ্জন। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ হ'ল। যন্ত্র

চালিতের মত প্লেটগুলো ধুয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এলো ঘরে।

রঞ্জনের আলিঙ্গনে হারিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ে সুমিত্রার বহুদিন আগে একবার মরতে চেয়েছিল সে। ওর সেই ইচ্ছেটা বুঝি পূর্ণ হয়ে গেছে ওর নিজের অজান্তেই। ঘটনাটা কখন ঘটলো তা টের পায়নি সে, শুধু তার সত্যতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করছে আজ। একটা মৃতদেহকে টেনে নিয়ে ফিরেছে সে এতকাল। ----- অবচেতনার স্তর থেকে ছোট্ট কাঁটার মত আরও কি একটা কথা বিঁধতে থাকে তাকে। ভাল করে মনে করতে পারে না সে -----। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। টুবলু। তার নাম টুবলুই তো ! প্রতুলকাকা খামে করে ফটো পাঠিয়েছিল বাবার কাছে। মা দেখিয়েছিল সুমিত্রাকে। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠেছিল, তবু মা'র সামনে কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, "ইস্ কি মিষ্টি! আবার কেমন দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে হাসছে দ্যাখো!" রন্কার ছেলে। সেদিন ফটোটা ভাল করে দেখেও নি সুমিত্রা, দেখার ভান করেছিল শুধু। আজ এতবছর পরে সেই না দেখা ফটোটা অন্ধকারে বারে বারে ভেসে ওঠে ওর মনের সামনে, জোর করে মনোযোগ দাবী করে। অন্ধকারে উঠে বসলো সুমিত্রা।

"কি হ'ল?"

"কিছুনা, আসছি।"

দরজা খুলে বাইরে এলো সুমিত্রা। সিঁড়ি দিয়ে ক'ধাপ নেমে বাথরুম। বাথরুমের দরজার কাছে পৌঁছে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো। তারপর পাশের সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে এক তলায় নেমে এলো। বাইরে যাওয়ার দরজার পাশে একটা র‍্যাক। গোটা কয়েক ওভারকোট ও একটা ম্যাকিন্টশ ঝুলছে। একটা ওভারকোট টেনে নিয়ে গায়ে চাপালো, তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লো।

ক্যান্টারবেরী রোডের দিকে পা চালিয়ে দিল সুমিত্রা। ঠাণ্ডায় হাত পা যেন জমে যাচ্ছে তার। ওভারকোটের তলায় পাতলা একটা রাত্রিবাস শুধু, পায়ে কাপড়ের চটি। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে একটা শাদা বাড়ির গেটে পৌঁছলো। সন্তর্পণে গেট খুলে ঢুকলো। বাড়ির পিছন দিকে একটা বড় জানলা। জানলায় টোকা দিল বার কয়েক। কোন সাড়া শব্দ নেই।

কয়েক সেকেণ্ড থেমে আবার টোকা দিল, এবার আর একটু জোরে। তবু কোন সাড়া নেই। মাথাটা কেমন ভারী লাগছে, হাত পা গুলো নিঃসাড় হয়ে আসছে ক্রমশ। পায়ের কাছে একটা সরু ডাল পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে জানলায় ঠুকতে লাগলো। নীচু গলায় ডাকলো, "ওয়েণ্ডি, ওয়েণ্ডি, প্লীজ কাম আউট।" আলো জ্বলে উঠলো ঘরে। পর্দার ফাঁক দিয়ে শার্সির গায়ে একটা মুখ দেখা দিল,

"হু ইজ দেয়ার?"

"ওয়েণ্ডি, ইট্স মী। সুমিত্রা।"

"ও মাই গড ! মাই পুওর সু'! হোয়াট হ্যাপেন্ড্?"

সামনের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো ওয়েণ্ডি। সুমিত্রার ততক্ষণে ঠাণ্ডায় দাঁত কপাটি লেগে গেছে। ওকে ঘরে এনে ওয়েণ্ডি নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলো লেপ কম্বল চাপা দিয়ে। গরম পানীয় ধরলো মুখের কাছে।

রেখে ঢেকে যেটুকু বললো সুমিত্রা তার বেশী আর জানতে চাইলো না ওয়েণ্ডি। মাঝে মাঝে ট্রাব্ল্সাম্ বয়ফ্রেণ্ডের খপ্পরে তাকেও পড়তে হয়েছে। ওর ল্যাণ্ডলেডী বুড়ি কয়েকদিনের জন্যে লণ্ডনে গেছে। এ ক'টা দিন সুমিত্রাকে ওর কাছে থাকার আমন্ত্রণ জানালো। ক'দিন নয়, মাত্র রবিবারটা ওখানে কাটালো সুমিত্রা। সোমবার সকালে ওয়েণ্ডিকে সঙ্গে নিয়ে এবং ওর ধার দেওয়া পোষাক পরে নিজের রুমে এলো। প্রতিবেশী রিচার্ড খবর দিলো যে সুমিত্রার গেস্ট রবিবার সকালেই চলে গেছে। না, সুমিত্রার জন্যে কোন মেসেজ রেখে যায়নি সে। সুমিত্রা যে দু'দিন উধাও হয়ে গেছিল এবং কেন বা কোথায় গেছিল সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতুহল দেখায় না কেউ। তিনতলার বাসিন্দা মাইকেলকে তার ওভারকোট ফেরৎ দিয়ে, ওকে অসুবিধেয় ফেলার জন্যে মাফ চাইতে গেলে এক গাল হেসে নিরস্ত করলো সে। তার কোটটা যে সুমিত্রার কাজে লেগেছে তাতেই নাকি সে কৃতার্থ।

ওয়েণ্ডিকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো সুমিত্রা। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলো অনেকক্ষণ। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। যেন নেশার ঘোরে ছুটে বেড়াচ্ছিল এত বছর। নেশা কেটে গেছে, এখন শুধু অবসাদ। এখন শুধু ক্ষতির হিসেব এবং

আত্মধিক্কার। মাথাটা অদ্ভুত পরিষ্কার লাগছে সুমিত্রার।এতটুকু জড়তা নেই, এতটুকু গোঁজামিল নেই কোথাও।

পাশের টেবিল থেকে ললিতপ্রসাদের চিঠিখানা তুলে নিলো। আজকের ডাকে এসেছে। খাম খুলে চিঠিটা বার করতেই ভিতর থেকে দু'টো ছবি মাটিতে পড়লো। ছবি দু'টো হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলো সুমিত্রা। কোনও ম্যাগাজিন থেকে কাটা ফুটফুটে দু'টি বাচ্চার ছবি। ছবির নীচে লেখা টিঙ্কু ১৯৬২; কুমকুম ১৯৬২ ---। ললিতপ্রসাদের হাতের লেখা। অর্থাৎ আজ থেকে চার বছর পরে এই বয়সের দু'টি সন্তানের প্রত্যাশা ললিতের এবং তাদের আগেভাগে জন্ম দেবার দায় নাকি সুমিত্রার।

চিঠিটা অর্ধেক পড়েই সরিয়ে রাখলো সে। এতক্ষণ শুধু নিজের ক্ষতির দিকটাই ভাবছিল সুমিত্রা। আর একটা মানুষ যে স্বেচ্ছায় নিজের শুভাশুভ ওর উপর ছেড়ে দিয়েছে সে কথা মনে পড়েনি। নিজেকে হঠাৎ জাল বদ্ধ হরিণের মত মনে হ'ল তার। গত ক'বছরের পাগলামীগুলো যেন প্রেতিনীর রূপ ধরে ওর মনশ্চক্ষুর সামনে এসে তাণ্ডব জুড়ে দিলো। ললিতপ্রসাদকে লেখা চিঠিগুলোর প্রতিটি কথা মনে পড়তে থাকে ওর। সুমিত্রার মুখ ক্রমশ আরক্ত হয়ে উঠলো। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরলো সে। কিছুক্ষণ পরে যখন উঠে দাঁড়ালো সুমিত্রা ওর চেহারা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা মেক্আপ করলো। রুম হিটার বন্ধ করলো। ওভারকোট পরে দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে কি ভেবে ফিরে এলো আবার। ম্যাণ্টল্পীস থেকে ললিতপ্রসাদের ফটোটা নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলো। তারপর দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

(৭)

এর পরের সপ্তাহগুলো যেন বিকারের ঘোরে কেটেছে সুমিত্রার। নিজের ভরণপোষণ চালাতে নানারকম ছুট্কো কাজ করতে হয়েছে তাকে, বাকি সময়টা হন্যে হয়ে ঘুরেছে একটা পাকা চাকরির আশায়। প্রায় মাসদুই পর ফললাভ হ'ল। ক্যানাডায় একটা কলেজে কাজ পেলো

সে। সুমিত্রার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ সেটা। অতীতের সব গ্লানি ঝেড়ে ফেলে (অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল তার) নতুন পথের শুরু। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে একটা ছক কেটে ফেলেছে সে। ঘর-সংসার তার জন্যে নয়। তার হ'বে একক জীবন। ভালবাসা সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে এ জন্মের মত তাই যথেষ্ট, ও পথে আর পা বাড়াবে না কোনদিন। জীবনে ঘর বাঁধাই একমাত্র শ্রেয় নয়। সে বিদুষী হ'বে, যশস্বিনী হ'বে। দেশজোড়া নাম অর্জন করবে।

সেণ্ট মার্থা কলেজে মোটামুটি সুনাম করেছিল। প্রচুর পড়াশোনা করতো, কোনরকম চাপল্যকে প্রশ্রয় দিতো না। এইভাবে প্রায় দু'বছর কাটলো। কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু ছিল। সুলতা চক্রবর্তী তাদের অন্যতম। ওর স্বামী ডাক্তারী করে ওখানে। ছুটির দিনে প্রায়ই চক্রবর্তীদের বাড়ি নেমন্তন্ন থাকতো সুমিত্রার। আরও দু'চারজন বাঙালী ছেলে মেয়ে জড়ো হ'ত সেখানে। সবাই মিলে বাঙালী রান্না রাঁধতো, টেপ রেকর্ডে বাংলা গান শুনতো এবং সেই সঙ্গে চলতো এনতার আড্ডা।

সুলতার দাদা পঙ্কজকে সেখানেই প্রথম দেখলো সুমিত্রা। স্ট্যানফোর্ডে রিসার্চ করছিল, এবার দেশে ফিরবে। সেদিন আড্ডা ভাঙতে বেশ রাত হয়ে গেল। সুলতাদের গাড়িতে ফিরছে সুমিত্রা। চালকের সীটে পঙ্কজ।

রাস্তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঘরোয়া গলায় পঙ্কজ বললো, "আমি আগামী মাসে দেশে ফিরছি, জানেন বোধ হয় ----।"

"সুলতা বলেছে।"

দু'এক মুহূর্ত থেমে পঙ্কজ দ্বিধাজড়িত স্বরে বললো, "একটা কথা আপনাকে বলতে গিয়েও কিছুতেই বলে উঠতে পারছি না। ভয় হয় পাছে ভুল বোঝেন -----।"

"কি কথা?"

"উইল ইউ ম্যারী মী?"

খানিকক্ষণ উত্তর দিল না সুমিত্রা। যেন শুনতেই পায়নি সে। তারপর বললো, "আপনি তো আমাকে একেবারেই চেনেন না। যা বলছেন সে বিষয়ে ভাল করে ভেবে দেখেছেন?"

পঙ্কজ আবেগহীন শান্ত গলায় বললো, "আপনার সঙ্গে আলাপ

হ'বার পর থেকে, অর্থাৎ গত পাঁচদিন থেকে এই একটি বিষয়েই ভেবেছি শুধু। তবে স্বীকার করি আপনার পক্ষে ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কাজেই জবাব দেবার আগে যদি ভেবে দেখার সময় চান সেটা খুবই ন্যায়সঙ্গত হ'বে।"

"ভেবে দেখার সময় চাইনা আমিও। আমি ---- আমি ----" হঠাৎ ভাষা খুঁজে পায়না সুমিত্রা। পঙ্কজের উজ্জ্বল দু'টি চোখের উপর থেকে নিজের দু'চোখ সরিয়ে নিয়ে কোনমতে শেষ করে, "আমি সম্মানিত বোধ করছি আপনার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে ----।"

গাড়িটা তখন ওর ফ্ল্যাটের বাইরে থেমেছে। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলো সুমিত্রা। দ্বিধাজড়ানো গলায় বললো, "আচ্ছা, গুডনাইট!" তারপর ক্ষিপ্রহাতে গেট খুলে জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে বাড়ির ভিতর চলে গেল। এর কয়েকদিন পরেই বিয়ে করলো ওরা।

(৮)

দেশে ফিরে পঙ্কজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ের রিসার্চ ও ডেভেলপ্‌মেণ্ট বিভাগে যোগ দিল।

দিনগুলো নিয়মিত ছন্দে আসে আর যায়, যেন রোজারির এক একটি বীড। জ্বালা নেই, মাদকতার তীব্রতা নেই। শুধু নিশ্চিন্ততা, শুধু পরিপূর্ণতা, শুধু প্রশান্তি। সুমিত্রা মনে মনে বলে, "জানিনা আমরা পরস্পরকে ভালবাসি কিনা। এ যদি ভালবাসা নাও হয় তবু দুঃখ নেই। শুধু চিরদিন এই ভাবে আমাকে ঘিরে থেকো তুমি। আড়াল করে রেখো যা দেখতে চাইনা, যা ভাবতে চাইনা, যা শুনতে চাইনা তার কাছ থেকে।"

একবার শুধু রুদ্ধ অতীতের দরজায় আঘাত হেনেছিল একটি ছোট্ট ঘটনা। ওর মেয়ে অনুরাধা তখন পেটে। ভারী শরীরটাকে টেনে সাবধানে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছে সুমিত্রা। স্থান ছাপরা স্টেশন। পঙ্কজ কুলিদের নিয়ে ব্যস্ত। সুমিত্রা এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওর মাত্র চার পাঁচ হাত দূরে সামনে দাঁড়িয়ে ললিতপ্রসাদ ওর দিকেই তাকিয়ে

রয়েছে। ওর দৃষ্টিতে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, প্রীতি নেই, কামনা নেই। ভাবলেশহীন মরা চোখে সুমিত্রার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখছে সে। সুমিত্রার পা দু'টো যেন কোন সন্মোহিনী বলে সেখানেই আটকে গেল। ব্যাকুল চোখে এদিক ওদিক পঙ্কজকে খুঁজতে লাগলো সে। পঙ্কজ ওর দিকে এগিয়ে এলো। ললিতপ্রসাদ ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলো ওরা। রাস্তার একপাশে আবর্জনার স্তূপ পড়ে রয়েছে। কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর কামড়াকামড়ি করছে গলিত উচ্ছিষ্টের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। সেই মুহূর্তে সুমিত্রার ইচ্ছে হ'ল ওই পচা গলা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে বাইরের পৃথিবী থেকে নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে লুপ্ত, নিশ্চিহ্ন করে দিতে। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হ'ল যে ও যদি সত্যিই এখন ওখানে গিয়ে নামে ওই মাছিবসা ঘেয়ো কুকুরগুলো ওর স্পর্শ বাঁচানোর জন্যে যেন্নায় কঁকাতে কঁকাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাবে।

(৯)

সুমিত্রার চিঠি মাঝে মাঝে আসতো। ওর ঘর গেরস্তালির খুঁটিনাটি সংবাদ বহন করে। চিঠির শেষে থাকতো দিল্লী যাওয়ার সাদর আমন্ত্রণ। বছর কয়েক পরেই সুযোগ জুটে গেল। N.C.E.R.T.তে একটা সেমিনারে অংশ নিতে ডাক পড়লো। সাগ্রহে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যাবার আগে সুমিত্রাকে চিঠি দিলাম নিজের প্রোগ্রাম জানিয়ে।

দিল্লী স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে কুলির সঙ্গে দর কষছি হঠাৎ দেখি সপরিবারে সুমিত্রা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে এসে আমার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলো।

"ইস্, কত বছর পরে দেখলাম তোকে! মীনু, এই আমার কর্তা পঙ্কজ আর এটি আমার কন্যারত্ন। নুরুদ্দীন, মাসিকে নমস্কার করো ---- ।"

ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর বাচ্চাটা দু'হাত জড়ো করে বললো, "নমত্তাল মাছি।"

"সে কি, তোমার নাম নুরুদ্দীন হ'ল কি করে?"

"আসলে ওর নাম অনুরাধা। অনু নামটা বড্ড কমন। আমার এক মাসির নাম আবার রাধা। তাই ও দু'টো বাতিল করে ওর ডাক নাম দেওয়া হয়েছে নুর। আমরা আদর করে ওকে কখনও ডাকি নুরুদ্দীন কখনো বা নুরজাহান ----।"

আমরা ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পড়েছি। পঙ্কজ গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে দরজা খুলে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেলাম আমরা। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে খাবার ঘরে এলাম। সুমিত্রা ব্যস্তভাবে কিচেন থেকে প্লেটে করে ওমলেট ও টোস্ট এনে টেবিলে রাখছে।

আমায় দেখে একটু হেসে বললো, "আয় বোস্। আমার ঝিটার আবার দু'দিন হ'ল চোখ উঠেছে। আসতে মানা করে দিয়েছি ওকে ----।"

পঙ্কজ হেসে বললো, "হ্যাঁ, সুমির ঝি উপস্থিত আণ্ডার হাউস অ্যারেস্ট বলতে পারেন। তার উপর হুকুম জারী করা হয়েছে, স্ট্রিক্টলি পর্দানশীন হয়ে সারভেন্টস্ কোয়ার্টারে বিরাজ করতে। বাইরের কাকপক্ষীটিও যেন না দেখে ওকে ----।"

সুমিত্রা বললো, "কি দরকার বাপু রোগ ছড়িয়ে। পঙ্কজ বলছিল ওকে এক জোড়া গগল্স্ দিতে। গগল্স্ পরে বাসন কোশন মেজে দিয়ে যাক। আমি বল্লাম দরকার নেই। ভারী তো ক'টা বাসন ----।"

সুমিকে দেখে মনে মনে অবাক লাগছিল। সিঁথি ভরে সিঁদুর পরেছে, কপালে বড় টিপ। দু'হাতে সোনার চুড়ির পাশে শাঁখা ও লাল পলার রুলি। অক্লান্ত নিপুণ হাতে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে একটার পর একটা। স্বামী, কন্যা ও অতিথির প্রতিটি প্রয়োজন সম্পর্কে সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি। আগেকার সুমিত্রার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই চেহারা ছাড়া। চেহারাতেও আগেকার সেই দৃপ্ত অথচ লাজুক ভঙ্গিটি নেই আর।

পরের দিনগুলো সেমিনারের কাজেই কেটে গেল। সেমিনারে ভাগ নেবেন যাঁরা তাঁদের থাকার জন্যে কার্যকর্তারা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি সুমির অনুরোধ এড়াতে না পেরে ওদের বাড়িতেই রয়ে গেলাম। অবশ্য সন্ধ্যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টাই শুধু ওদের সঙ্গে কাটাতাম। সকালে উঠেই আবার ছুটতে হ'ত N.C.E.R.T.তে।

সাতদিন বাদে ওদের কাছে বিদায় নিয়ে পাটনার ট্রেন ধরলাম। সঙ্গে করে আনলাম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সুখী পরিবারের স্মৃতি। ট্রেন ছাড়ার আগে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করেছিল, "আমার কর্তাকে কেমন লাগলো বল্।"

বল্লাম, "সাক্ষাৎ মহাদেব। উত্তুঙ্গ - তরঙ্গিনী - জাহ্নবীকে হেলায় বশ করেছেন, জানিনা কোন যাদুমন্ত্রে। ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীম। হ্যাট্স্ অফ্ টু হিম ----।"

নুরুদ্দীনকে একটা বড় ফারের কুকুর উপহার দিয়েছিলাম। তারপর থেকে ও আমায় ডাকতো "ভো ভো মাছি" বলে। গার্ডের হুইস্ল্ শুনে ট্রেনটা দুলে উঠলো। বাবার কাঁধে পা ঝুলিয়ে বসে নুরুদ্দীন হাত নাড়ছে আর চেঁচাচ্ছে, "ভো ভো মাছি তা তা!" ক্রমে ট্রেনের গতি বাড়লো। চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা। শুধু ট্রেনের চাকার আওয়াজ যেন তারই প্রতিধ্বনি তুলে সমানে বলে চললো, "ভো ভো মাছি তা তা, ভো ভো মাছি তা তা -----।"

(১০)

কয়েকটা বছর কেটে গেছে। সুমির চিঠির হার কমতে কমতে একেবারে থেমে গেছে একসময়। গত দু'তিন বছর হ'ল বিজয়ার স্নেহসম্ভাষণটুকুও পাঠায় না আর। শুধু প্রতিবছর ইংরিজী নববর্ষে একটা ছাপানো কার্ড আসে সুমিত্রা - পঙ্কজ - অনুরাধার যৌথ শুভেচ্ছা নিয়ে। হাতের লেখাটা পঙ্কজ কিংবা তার মেয়ের। এ নিয়ে সুমির প্রতি অভিমান হয়নি। নিজের বোনেদের বেলাতেও দেখেছি বিয়ের পর ক'টা বছর যেতে না যেতে এমন ভাবে সংসারের পাকে জড়িয়ে পড়ে যে অন্য কারো কথা ভাববার ফুরসৎ পায় না আর। তাছাড়া আগেই বলেছি, আমি ছিলাম ওর confidante ---- ওর জীবনে পঙ্কজ আসার পর স্বাভাবিক নিয়মেই সে হিসেবে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এটুকু উপলব্ধি করার মত বয়েস ও বুদ্ধি আমার তখন হয়েছিল। বরং এর অন্যথা হ'লেই চিন্তিত হ'তাম আমি। এর পরের ঘটনাগুলোর খানিকটা প্রত্যক্ষদর্শী আমি। বাকিটা জেনেছি সুমির ডায়েরী থেকে। সে কথা যথা সময়ে বলবো।

(১১)

সুমিত্রাদের বাড়িটা একতলা। সামনে ও পিছনে জমি আছে অনেকটা। সামনে লন ও কিছু ফুলগাছ, পিছনে কিচেন গার্ডেন। মালী একটা আছে, সে না থাকারই শামিল। রোজ একবার বুড়ি ছুঁয়ে যায়। মেমসাব'কে লম্বা সেলাম ঠুকে সাড়ম্বরে খুরপি, জলের পাইপ ইত্যাদি বার করে জানান দেয় যে কাজ শুরু হয়েছে। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ধীরে সুস্থে ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করে ধরায়। খানিক বাদে খুরপি টুরপি সব যথাস্থানে রেখে আরেক দফা সেলাম এবং প্রস্থান। বাড়ির সামনে গোলাপ - যুঁই - চন্দ্রমল্লিকা ও কিচেন গার্ডেনের বেগুন - মূলো - টোমাটোর কৃতিত্ব মালীর নয়, সম্পূর্ণভাবে মালিকের। অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় পাল্টে সোজা বাগানে চলে আসে পঙ্কজ। গাছপালার তদারক ও খিদমৎ করে।

সুমিত্রা মাঝে মাঝে রাগ করে, "একি, অফিস থেকে খেটে খুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে বাগান নিয়ে পড়লে কেন? একটু বিশ্রাম করো !"

পঙ্কজ হেসে বলে, "এই তো বিশ্রাম।"

মাটির সঙ্গে কি একটা নাড়ির যোগ আছে ওর। অফিসে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে মাঝে মাঝে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু কাগজ আর কাগজ। অন্তহীন কাগজের তাড়া ধাপে ধাপে কখনো উপরে উঠছে কখনো নামছে নীচে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনীশক্তি তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে অবিরাম কাগজ চালাচালির নিস্ফল আচারানুষ্ঠানে। এই একফালি বাগান যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয় তার ক্লান্ত খিন্ন দেহ মনে। আগে আগে সুমিত্রা এসে পাশে দাঁড়াতো। গাছপালা সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই তার, বিশেষ কৌতুহলও নেই। তবু অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসতো, রান্নাঘরের সিঁড়িতে এসে বসতো কখনো বা। মাঝে মাঝে একটা ছোট্ট বেতের ঝুড়ি আনতো হাতে করে। পঙ্কজ তার বাগানের বেগুন - ভিণ্ডি - টোমাটোর ফসল তুলে দিতো। সুমিত্রা চোখে মুখে বিস্ময় ও সম্ভ্রম ফুটিয়ে গ্রহণ করতো সেগুলো।

সে সব অনেকদিন আগের কথা। ইদানীং এদিকে বড় একটা আসেনা সুমিত্রা। এলেও অতি সন্তর্পণে, শাড়িটাকে একটু উঁচু করে, স্পর্শ বাঁচিয়ে

পা ফেলে। আজকাল এখানে এলে তার চোখে পড়ে শুধু কাদা, কেঁচো আর ব্যাঙাচি।

টোমাটোর কেয়ারীর মাটি আলগা করতে করতে বেডরুমের পিছনের দেয়ালটা পঙ্কজের চোখে পড়লো। দেয়ালের গায়ে প্রায় চারপাঁচ হাত লম্বা একটা লাইন চলে গেছে ----- চিড় ধরার দাগ। দাগটা রোজই চোখে পড়ে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যায় পঙ্কজ, বুকের কাছে কেমন অস্বস্তি হ'তে থাকে তার। এ বাড়িটায় বছর দুয়েক হ'ল এসেছে ওরা। এর আগে ওরা থাকতো ডি.টু. কোয়ার্টারে। বছর চারেক আগে প্রোমোশন পেয়ে ডেপুটি চীফ্ সাইন্টিফিক অফিসার হওয়ার পর আরও বড় বাড়ি পাওনা হ'ল তার। কিন্তু তখন বাড়ি খালি ছিল না, ওয়েটিং লিস্টে নাম উঠলো। নতুন কয়েকটা কোয়ার্টার তৈরী হ'লে পর ঝকঝকে আনকোরা বাড়ি পেলো ওরা। সে বাড়ির দেয়ালে এত তাড়াতাড়ি ফাটল ধরার কথা নয়। অবশ্য ফাটলটা শুধু উপরের প্লাস্টারে, নাকি একেবারে ভিতরের গাঁথনিতে তা সঠিক বলা যায়না এখনও। C.P.W.D.তে খবর দিলেই হয়তো লোক পাঠিয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করবে ওরা। কিন্তু পঙ্কজ C.P.W.D.তে রিপোর্ট করে নি। রোজ বাগানে এলেই ফাটলটা চোখে পড়ে ওর। আর তখনি ও কেমন গম্ভীর, অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

খুরপি ও বালতিটা শেডে রেখে বাইরের কলে পা ধুলো পঙ্কজ। বাড়িতে ঢোকার আগে দরজার কাছে রাখা পাপোষটায় পায়ের তলা ঘষলো ভাল করে। সুমিত্রা ঘরের মেঝেয় কাদার ছাপ দেখলে চটে যায়। আজকাল আরও অনেক কিছুতে চটে যায় সে। পঙ্কজের মনে হয় অহর্নিশি চটাটাই অনিবার্যভাবে স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তার, চটার কারণগুলো গৌণ।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঝন্ ঝন্ করে মেঝেয় বাসন পড়ার শব্দ শুনলো। সেই সঙ্গে সুমিত্রার তর্জন, "একে বাসন মাজা বলে? পরিষ্কার দেখলাম ডেকচির গায়ে এঁটো লেগে রয়েছে। তার উপর মুখে মুখে তর্ক করা হচ্ছে!" নতুন ঝি বিড়বিড় করতে করতে মেঝে থেকে বিক্ষিপ্ত মাজা বাসনগুলো তুলে আবার করে মাজতে বসলো। পঙ্কজ বুঝলো এ ঝিটাও কেটে পড়বে শীগ্গীর।

শোবার ঘরে অনুরাধা চুপচাপ শুয়ে আছে। ডান হাতটা আড়াআড়ি ভাবে কপাল ও চোখের উপর রাখা। ঘরে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে ওর ফোঁপানির শব্দ শুনেছে পঙ্কজ। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই অনুরাধা তড়িৎবেগে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। পঙ্কজ ওর পাশে গিয়ে বসলো। মাথায় হাত রেখে বললো, "খেলতে গেলে না নুর?"

"না, বাবা। আমার মাথা ধরেছে ----" গলাটা ভারি ভারি শোনালো।

পঙ্কজ চুপ করে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, "চল্ একটু chess খেলি। আজ নির্ঘাৎ হারিয়ে দেবো তোকে ----।"

অনুরাধার কান্নাভেজা চোখে খুশির ছোঁয়া লাগে, "ইস্, হারালেই হ'ল ! জানো আমাদের কলেজে chess খেলায় চ্যাম্পিয়ন আমি?"

পঙ্কজ ওর পিঠ ঠুকে দিয়ে বলে, "বেশ, চলে এসো তাহ'লে। এ বাড়ির চ্যাম্পিয়ন কে তার ফয়সলা হয়ে যাক আজ।"

তড়াক করে উঠে বসে অনুরাধা। হাতের পিঠ দিয়ে ভিজে গাল দু'টো মুছে নিয়ে ড্রয়ার খুলে চেস্‌বোর্ড ও ঘুঁটিগুলো বার করে খাটের উপর বিছিয়ে বসে।

অনুরাধার জীবনে সম্প্রতি যে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে তার গোড়াপত্তন হয়েছে বহু বছর আগে। ছোটবেলায় ওর একটা ফারের কুকুর ছিল। খেলনাটাকে ভীষণ ভালবাসতো সে। কুকুর বলতে পারতো না, ডাকতো তুতুল বলে। সেটাকে বগলদাবা করে নিয়ে বেড়াতো সর্বক্ষণ। নিজের খাবারের থালাটা তার সামনে ধরে দিয়ে সাধাসাধি করতো খাওয়ার জন্যে। রাত্রে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতো। খেলার কুকুরের প্রতি ওর এত অনুরাগ দেখে পঙ্কজ ঠিক করেছিল মেয়ে একটু বড় হ'লে সত্যি একটা কুকুরছানা এনে দেবে ওকে। ক্রমে ক্রমে মেয়ে বড় হ'ল। কুকুর পোষার সঙ্কল্পটা সাকার নেবার সম্ভাবনা দেখা দিল এই নতুন বাড়িতে এসে। ওদের প্রতিবেশী ডক্টর ভাটনাগরের কন্যা ললিতা অনুরাধার সমবয়সী ও বন্ধু। ওদের ককারস্প্যানিয়াল শেরী ক'দিনের মধ্যেই অনুরাধার একান্ত ন্যাওটা হয়ে পড়লো। শেরীকে অদূর ভবিষ্যতে পাত্রস্থ করার পরিকল্পনা চলছিল। অনুরাধার কুকুর-প্রীতি দেখে মুগ্ধ

ভাটনাগর দম্পতি প্রথম কুকুরছানাটি ওকেই উপহার দেবেন বলে ঘোষনা করলেন।

এ সব বেশ কিছুদিন আগের কথা। মাসখানেক হ'ল নরম পশমের বলের মত তিনটি বাচ্চার জননী হয়েছে শেরী। সুমিত্রা প্রথম থেকেই কুকুর পোষা বিষয়ে অনিচ্ছা দেখিয়ে এসেছে কিন্তু ওকে সিরিয়াসলি নেয়নি পঙ্কজ। ও ভেবেছিল মা'র মন নরম হ'বে মেয়ের মুখ চেয়ে। বাইরে যতই খুঁতখুঁত করুক শেষপর্যন্ত সে মেনে নেবে ব্যবস্থাটা। তাই কাল বিকেলে যখন ডক্টর ভাটনাগর সস্ত্রীক-সকন্যা শেরীর সেরা বাচ্চাটার গলায় লাল রিবন বেঁধে তাকে একটা ছোট্ট বাস্কেটে ভরে এনে অনুরাধার নাম ধরে ডাকলেন, অভ্যর্থনা জানাতে হাসিমুখে এগিয়ে গেছিল পঙ্কজ। বাস্কেটসুদ্ধু কুকুরছানাটাকে অনুরাধার হাতে তুলে দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ভাটনাগর-দম্পতি। কিন্তু তা আর বলা হ'ল না। ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিত্রা প্রবেশ করলো। অতিথিদের উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়ের উপর।

একটানা অনেকক্ষণ বকাবকি এবং কুকুরছানার মুণ্ডপাত করে শ্রান্ত হয়ে যখন থামলো সুমিত্রা, সে ঘরে তখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। ভাটনাগররা অনেক আগেই তাদের উপেক্ষিত উপহারের ডালি নিয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। শোবার ঘরের ছিটকিনি বন্ধ করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে অনুরাধা। একহাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে রয়েছে পাছে তার কান্নার আওয়াজ বাইরে পৌঁছলে আরও কিছু বিপত্তি ঘটে। আর স্টাডিরুমে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ, অনড় হয়ে বসে আছে পঙ্কজ। তার ভিতরটাও যেন জমে পাথর হয়ে গেছে আজ। সুমিত্রার আপত্তিটাকে এতদিন খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি সে। আসলে মেয়েটা এত বছর ধরে বাবার দেওয়া একটা প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে ধরে আশা করে বসে আছে, তার সে আশাটুকু নির্মূল করতে মন সরে নি পঙ্কজের। তাছাড়া সুমিত্রার আপত্তিটা যে এমন সাংঘাতিক ও লজ্জাকর রূপ নেবে সেটাই কল্পনা করে নি কোনদিন। ভেবেছিল বাপ ও মেয়ে যেমন সুমিত্রার ইদানীংকার নিত্যনতুন বাধা-নিষেধ-সতর্কতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে চলতে শিখেছে, এ সংসারে এসে কুকুরছানাটাও তেমনি নিজের গণ্ডিটা চিনে নেবে। ওরাই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে ওকে। শুধু

উঠতি বয়সের কিশোরী মেয়েটা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন পাবে একটা। পাবে একমুঠো খোলা আকাশ।

(১২)

এই সময় দিল্লী ইউনিভার্সিটি একটা প্রজেক্ট ওয়ার্কের ভার দিল আমায়। বছর খানেক থাকতে হ'বে সেখানে। দিল্লী পৌঁছনোর পরের রবিবার সকালবেলা সুমিদের বাড়ি গিয়ে হাজির হ'লাম। পঙ্কজ দরজা খুলে আমায় দেখে অভ্যর্থনা জানালো, "আসুন, আসুন। নুর এই দ্যাখো তোমার মীনা মাসি এসেছেন। মাকে বলে এসো। কবে এলেন দিল্লীতে?"

অনুরাধা এসে বললো, "বাবা, মা ওঘরে ডাকছে মাসিকে।"

পঙ্কজ খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললো, "ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না অনেক দিন ধরে।"

"কি হয়েছে?"

"ঠিক কি যে হয়েছে বলা মুস্কিল। ডাক্তাররা কোনও রোগ ধরতে পারেনি এখনও। নানারকম উপসর্গ ----- বুক ধড়ফড় করে, ঘুম হয় না, খেতে ইচ্ছে করে না, জেনেরাল ডিপ্রেশন ----।"

"ব্লাড-প্রেশার ট্রেশার গুলো দেখিয়েছেন?"

"ব্লাড-প্রেশার, হার্ট সব থরো চেক-আপ করানো হয়েছে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ সবরকম ট্রাই করেছি। উপস্থিত নার্ভের জন্যে টনিক খাচ্ছে একটা ---- ।"

শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ধূপধুনোর গন্ধে ভরপুর সে ঘর। চেস্ট-অফ-ড্রয়ারের উপর দাড়ি-গোঁফ সম্বলিত একটা এনলার্জ করা ফটোর গায়ে টাটকা গাঁদাফুলের মালা। ফটোর সামনে ধূপ জ্বলছে।

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে পঙ্কজ ক্লান্ত, নিস্পৃহ গলায় বললো, "সুমির গুরুদেব।"

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম পঙ্কজের কপালে অনেকগুলো সুক্ষ্ম সমান্তরাল লাইন চলে গেছে। দু'পাশে রগের চুলে শুভ্রতার ছোপ। নীচু হয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ খুলে চৌকাঠের বাইরে জুতো জোড়া রেখে ভিতরে

ঢুকলাম।

"আয় ---- ।"

বালিশে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে সুমিত্রা। পঙ্কজ আমার জন্যে একটা চেয়ার এনে খাটের পাশে রাখলো, তারপর দরজাটা আলগোছে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আয়, বোস্।" আমায় ইতস্তত করতে দেখে আবার বললো সুমি, "বোস্ ওখানটায়। কবে এলি?"

নিরুত্তেজ, নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বর। ভেবে এসেছিলাম বিরাট একটা সারপ্রাইজ দেবো, ওদের পরিবারে হুলস্থুল পড়ে যাবে আমার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে। হায়রে, এ কি সংবর্ধনা ! কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের অহং এর সমস্যা থেকেও সুমির অবস্থাটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে তোর?"

ও বললো, "কি জানি, বুঝতে পারিনা। বোধহয় দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

হেসে বললাম, "ইস্, দিন ঘনিয়ে এলেই হ'ল ! দিনের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে শুনি?" দিল্লীতে আমার কাজের কথা বললাম।

সুমি বললো, "খুব ভাল হ'ল। তোকে ভীষণ দরকার আমার।" তারপর অন্য কথায় চলে গেল।

অনুরাধা দরজার বাইরে থেকে বললো, "মা, চা এনেছি।"

"নিয়ে আয়।"

ট্রে নিয়ে ভিতরে এলো অনুরাধা। এক কাপ চা, একটা প্লেটে সিঙ্গাড়া ও মিষ্টি, এক গ্লাস জল। আমার পাশে একটা টিপয়ের উপর ট্রে'টা রেখে মার দিকে চাইলো।

সুমি বললো, "নুর এক কাজ করো। ফ্রিজে কিমা আছে, সেটা বার করো। ডাল তরকারী সব রান্না করে রেখেছি, কিমাটা তুমি রেঁধে ফ্যালো। হিঙ্ দিও, আর আদাবাটা। আর ধনে জিরে পাউডার। লঙ্কার গুঁড়োটা একটু আন্দাজ করে দিও।"

বললাম, "সে কি, নুর রান্না করতে পারে?"

অনুরাধা সগর্বে ঘাড় নাড়লো। বললো, "আমি মাংস রাঁধতে পারি,

লুচি ভাজতে পারি। জানো মাসি, আমি কেকও বানাতে জানি কিন্তু আজকাল তো আমাদের বাড়ি আর ডিম আসে না ----।"

"ডিম আসেনা কেন?"

"ডিম, পেঁয়াজ, রশুন, কিচ্ছু আসে না। মা যে মন্তর নিয়েছে ----।"

সুমি তাড়া দেয়, "হয়েছে, হয়েছে, আর পাকামো করতে হ'বে না তোমায়।"

অনুরাধা খালি ট্রে-টা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"খেয়ে নে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ----।"

"তুই খাবি নে?"

"নারে। আজ আমার উপোস।"

সত্যি বলতে কি মনে মনে ভারী অস্বস্তি লাগছিল। সুমির এ পরিবর্তন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। অবশ্য কার মধ্যে কি লুকিয়ে থাকে বলা যায়না কিন্তু তা বলে এ ভাবে একেবারে পাল্টে যেতে পারে কেউ? কিন্তু তখনি মনে পড়লো যে অন্তত সুমির ক্ষেত্রে হঠাৎ একেবারে সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যক্তিত্ব ধারণ এই প্রথম নয়। তেরো বছর আগে দিল্লীতে এসে ওকে যখন দেখলাম তখনও তাক লেগে গেছিল আমার। আমার আশৈশবের পরিচিত সুমিত্রার সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পাইনি নিরত কর্মরতা, নিরলস গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে। কিন্তু তখন ভেবেছিলাম বিয়ে ও মাতৃত্বের হয়তো বা কিছু যাদু আছে যার সঙ্গে আমি স্বভাবতই পরিচিত নই।

কয়েক মাস কেটে গেল। সুমিদের বাড়ি মাত্র বার তিনেক গেছি এর মধ্যে। প্রজেক্টের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে, ছুটির দিনেও প্রায় সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এছাড়া ওদের ওখানে যেতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করতাম না। এবার ওদের সংসারে প্রথম দিন যে বেসুরো সুরটা কানে বেজেছিল প্রতিবার তারই উত্তরোত্তর উচ্চতর প্রতিধ্বনি শুনেছি শুধু। মনে হ'ত কোন একটা বড় ক্রাইসিস চলছে সুমির জীবনে। ক্রমাগত যেন নিজের সঙ্গে যুঝে চলেছে ও, আর ক্রমশ চরম পরাজয়ের সম্ভাবনাটা নিশ্চিত মূর্তি নিচ্ছে ওর মনশ্চক্ষুর সামনে। যদি আমার পক্ষে ওকে কিছুমাত্র সাহায্য করা সম্ভব হ'ত নিশ্চয় এগিয়ে

যেতাম কিন্তু ওর সমস্যাটা যে ঠিক কি সেটাই বুঝতে পারতাম না। এতগুলো বছরের ব্যবধান দু'জনের মাঝে জড়তা ও দ্বিধার পাঁচিল গড়ে তুলেছে। আগেকার সেই সহজ অন্তরঙ্গতা আর নেই। তাছাড়া আজকের সুমি একেবারে অন্য জগতের মানুষ। তার পুজো-পার্বণ, গুরুভক্তি, শুচিবাইএর আড়ালে সে যে কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে বার করবো কেমন করে ! ওর কাছে গেলে শুধু ভারাক্রান্ত বিহ্বল মন নিয়ে ফিরে আসতাম। মনে হ'ত এর চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

সেদিন রবিবার। দুপুরে ঘরে বসে কাগজপত্তর দেখছি। সুমির ফোন এলো।

গলায় অভিমান ঢেলে সুমি বললো, "তুই যে একেবারে এমুখো হ'স না আর!"

নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল। বললাম, "আচ্ছা আজ সন্ধ্যেবেলা যাবো।"

"তার দরকার নেই। আমিই আসছি।"

ফোনটা রেখে মনে মনে ভাবলাম ---- আশ্চর্য, মানুষের সব বদলায়, শুধু বদলায় না তার গলার আওয়াজ। এ যেন অবিকল সেই আগেকার সুমি।

সন্ধ্যার আগেই এলো ও। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। "আমি কিন্তু অনেকক্ষণ থাকবো। তোর কোনও কাজ নেই তো?"

"কিচ্ছু কাজ নেই। আয়।"

হাতে ব্রাউন পেপারে মোড়ানো একটা বইয়ের প্যাকেট। সেটাকে পাশের টিপয়ে রাখলো। তার পাশে রাখলো শান্তিনিকেতনী কাজ করা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগটা। জুতোজোড়া খুলে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলো এক পাশে। তারপর কৌচটার উপর গুঁড়িশুঁড়ি মেরে বসে উজ্জ্বল দু'চোখে হাসির ঝিলিক তুলে বললো, "মীনু, শীগ্‌গির গরম গরম এক কাপ কফি খাওয়া দিকি!"

হালকা গোলাপী রঙের জর্জেটের শাড়ি পরেছে। কালো স্লিভলেস ব্লাউজ। শ্যাম্পু করা চুলগুলো ঘাড়ের কাছে আলগোছে খোঁপা করে বাঁধা ---- মনে হ'চ্ছে এই বুঝি খুলে পিঠময় ছড়িয়ে পড়বে তারা। গলায় একটা সরু হার চিকচিক করছে। দু'হাতে ম্যাচকরা কাঁচের চুড়ি। খোঁপায় একটা আধ-ফোটা গোলাপ ফুল। একটা অদ্ভুত আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় কুলে কুলে ভরে উঠলো আমার মন। হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার কৃতজ্ঞতা। কফি পারকোলেটরে কফি বসিয়ে একটা প্লেটে চানাচুর ঢাললাম, অন্য প্লেটে বিস্কুট। সুমি সামনে ঝুঁকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললো, "মীনু, মনে পড়ে বাঁকীপুরে সেই স্কুলের দিনগুলো?"

দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, "হ্যাঁ ----।"

"সেই যে মিস মিত্র আর মিসেস হাণ্ডা? আর সংস্কৃতের ঝা সার?"

হেসে ফেলে বললাম, "বেচারা সারা পিরিয়ড গোরুর মত করুণ চোখে তোর দিকে তাকিয়ে থাকতো ----।"

ক্লাশ এইটে আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন হরদ্বার ঝা। বছর পঁচিশেক মতন বয়স ভদ্রলোকের, চোখ দু'টো আকারে একটু বড়। ক্লাশ নিতেন আর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন ক্লাশের সেরা ছাত্রীটির পানে। সুমিত্রা একাগ্র চিত্তে পড়া নোট করে যেতো ঘাড় গুঁজে। সেদিন 'পঠ্' ধাতুর লঙ্ লকারটা ঠিকমত লিখতে পারিনি। ওর খাতা থেকে মিলিয়ে নেবো বলে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। পড়া নোট করছে না ছাই। লিখেছে ----

হরু যদি গরু হয়ে মাঠে চরে বেড়াতো

তাহ'লে বলোতো তাকে কত ভাল দেখাতো!

এরপর লেখার কথা লৃট লকারের রূপ। অনুতাপদগ্ধ সুমি লিখেছে ----

নারে হরু, তোকে আমি বলবো না গরু আর

তুই বড় ভাল ছেলে, থাক তুই হরদ্বার।

সুমিত্রা কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে ঠিক বিশ বছর আগের সুমির ভাষায় বললো, "টপ্‌স্!" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "শোন, তোর কাছে একটা ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে এসেছি। বুঝলি, নুরকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ চিন্তা হয় আমার।"

আমি হালকা গলায় বল্‌লাম, "নুরকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই তোর। ভেবে দ্যাখ ওর বয়সে তুই কেমন ছিলি ! ও তো নেহাৎ বাধ্য,

সুবোধ মেয়েটি।"

"তুই বলতে চাস্ আমি অবাধ্য ছিলাম?"

বললাম, "বাধ্যতার প্রশ্ন প্রজাদের বেলাতেই ওঠে, রাজাগজার বেলায় নয়। বিশ্বসুদ্ধু লোক তোর বাধ্য হ'তে পারলে বর্তে যেতো। অবশ্য তোর সুন্দর মুখখানা দেখে কারো কারো হৃদয় অবাধ্য হয়ে উঠতো, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়।"

"ফাজলামি নয় মীনু। সত্যি ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তিত আমি। নুর দেখতে সুন্দর। কিন্তু আমি চাইনা ও নিজের চেহারাটাকে এত প্রাধান্য দিক। লোকে ভাবে বাইরেটা সুন্দর করে সাজিয়ে আকর্ষক করে রাখলেই মেয়েদের সব দায় মিট্লো। যেন আর কিছু দেবার নেই তাদের। জানিস, দেখতে ভাল হবার একটা মর্মান্তিক দিকও আছে ----।"

আমি হাসি বজায় রেখে বল্লাম, "সত্যি? বাংলাদেশের অনেক মেয়েই কিন্তু সানন্দে রাজী হ'বে সুন্দর হওয়ার তথাকথিত ডিস্অ্যাডভাণ্টেজগুলোর সঙ্গে অসুন্দরতার অ্যাডভাণ্টেজগুলো এক্সচেন্জ করতে ----।"

সুমি উত্তেজিত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "তুই আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিস্ না মীনু। এই অন্তর্নিহিত মনোভাবটা মেয়েদের পক্ষে খুব একটা সম্মানের নয়। মনে কর ---- মনে কর ---- আচ্ছা ধর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বইটা কাউকে পড়তে দেওয়া হ'ল ---- ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। ক'দিন পরে বইটা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'চমৎকার বই মশাই, চমৎকার বই। কি সুন্দর বাঁধাই ! মলাটের রঙখানিও কি তোফা সিলেক্ট করেছে। আহা, তার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা নামটি যা খুলেছে না! অপূর্ব মশাই, অপূর্ব!' বল্তো, বইখানা সম্বন্ধে সবার মুখে এই রকম প্রশংসাবাণী শুনলে কবিগুরু কি খুশি হ'তেন? না, রাগে দুঃখে নিজের দাড়ি উপড়োতে ইচ্ছে হ'ত তাঁর? সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশী সত্যি, অনেক বেশী বেদনাময় ----। বলতে বলতে সুমি উঠে জানলার পাশে বেতের চেয়ারটায় গিয়ে বসলো।"

বললাম, "কি ব্যাপার বলতো ! এত বছর পর কি তোর মনে হ'চ্ছে যে পঙ্কজ বাইরের মলাটটা দেখেই মজেছে, ভিতরের তত্ত্ব মগজে ঢোকেনি তার?"

সুমি জানলার বাইরে তাকিয়ে ফ্যাকাসে গলায় বললো, "পঙ্কজের

কথা আলাদা। হি নেভার হ্যাড এনি ইল্যুসন, নর এনি রিগ্রেট ----।"

"হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?"

প্রথমটা উত্তর দিলনা সুমি। তারপর প্রায় আত্মগত ভাবে অস্ফুট কন্ঠে বললো, "আই ওয়রশিপ হিম।" ওর দৃষ্টি তখনো জানলার বাইরে।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম দু'জনেই। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালো সুমিত্রা। "আজ যাই মীনু। নুরকে একটু দেখিস প্লীজ। পুওর চাইল্ড, শী হ্যাড এ রাফ ডীল ইন্ লাইফ -----।" জুতোয় পা গলিয়ে ব্যাগটা তুলে নিল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে আমার একটা হাত টেনে নিয়ে বললো, "বাই মীনু। ভুলিস্ না।" ট্যাক্সিটা চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল। তক্ষুনি ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম এলোমেলো ভাবে। পুরোনো দিনের স্মৃতিরা ভিড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছে মনের আগল ভেঙে। আজ সুমিকে এভাবে ঠিক আগেকার চেহারায় দেখে মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল। ওর জন্যে যে কি পরিমান দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভ জমা হয়েছিল আমার মনে তা আজই প্রথম উপলব্ধি করলাম সেটা কেটে যাওয়ার পর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাইরে ছিলাম। ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজর পড়লো টিপয়ের উপর রাখা ব্রাউন পেপারের প্যাকেটটার উপর। নাঃ, সুমিটা ঠিক আগের মতই অগোছালো রয়ে গেল। ঘড়ি দেখলাম। দশটা বেজে গেছে। ওকে একটা ফোন করে দেবো কি? থাকগে, একটা বইয়ের প্যাকেটে এমন কিই বা দরকারী জিনিস থাকতে পারে ! তেমন কিছু হ'লে ও নিজেই ফোন করে খবর নিত। এরপর যেদিন ওদের ওখানে যাবো দিয়ে আসবো প্যাকেটটা। খানিকটা কাজ বাকী ছিল। কাগজপত্র বিছিয়ে নিয়ে বসলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে দু'চোখ চলে যাচ্ছে সুমির ফেলে যাওয়া প্যাকেটটার দিকে। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটানোর পর বিরক্ত হয়ে প্যাকেটটা টেনে নিলাম। টোয়ায়েন সুতো দিয়ে ভাল করে বাঁধা। ক্ষিপ্র হাতে সুতো কেটে প্যাকেট খুললাম। ও হরি, বই কোথায়, এ যে ডায়েরী! লাল রঙের চারটে ডায়েরী পর পর সময় হিসেবে সাজানো। বাইরে ক্রমসংখ্যা দেওয়া রয়েছে।

খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম। ওগুলো সুমি কেন এনেছিল, ও কি প্যাকেটটা ভুল করে ফেলে গেছে না ইচ্ছে করে? যদি ইচ্ছে করেই রেখে গিয়ে থাকে তবে আমায় বললো না কেন? এই সব নানা প্রশ্ন উত্যক্ত করতে লাগলো সমানে। কখন যে পাতা উল্টোতে শুরু করেছি মনে নেই। এক একটা লেখায় লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া। ডায়েরীগুলো ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার তালিকা নয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন বাদ পড়েছে, আবার কখনো বা পর-পর ক'দিনের নিয়মিত এনট্রি রয়েছে। খুব একটা ধারাবাহিকতা নেই লেখায়। প্রথমটা একটু দ্বিধা অনুভব করছিলাম অন্য একজনের গোপনীয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ করতে। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা প্রবল sense of urgency আমাকে যেন বাধ্য করছিল। নিছক কৌতুহল নয়, কেন জানিনা দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় ছেয়ে ফেলেছিল আমায়। নিঃশব্দে ও প্রায় রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যাচ্ছিলাম পাতার পর পাতা।

তৃতীয় ডায়েরীর একটা এনট্রি, দু'বছর আগের তারিখ দেওয়া :-

"আজ দুপুর বেলা এসেছিল সে। পঙ্কজ অফিসে, নুর স্কুলে। ঝিটাও সকালের কাজ সেরে চলে গেছে অনেকক্ষণ। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি একটি মহিলা। চেহারা দেখে সেল্‌স্ গার্ল বলে মনে হ'ল না। ভারী ক্লান্ত ম্লান মুখখানা। কুণ্ঠিত স্বরে বললো, 'ভিতরে আসতে পারি? মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে?' কেমন মায়া লাগলো। ভিতরে এনে বসিয়ে ফ্যানটা জোরে করে দিলাম। ভদ্রমহিলা তেমনি কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'আপনার স্বামী বাড়ি আছেন?' বললাম,'না।' এয়ারব্যাগটা খুলে একটা বড় কাগজের বাক্স বার করে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এইটা আপনাকে দিতে এসেছি -----।' অবাক হয়ে বাক্সটা হাতে নিয়ে উপরের ডালাটা খুললাম। বাক্সতে ঠাস বোঝাই চিঠি। আমার কি রকম ভয় করতে লাগলো। মহিলাটির দিকে চেয়ে দেখি ও কখন উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমার দিকে পিঠ করে। একটা চিঠি খুলে দেখলাম, তারপর আর একটা -----। কোনও ভুল নেই আর। আমারই লেখা চিঠি সব । ললিতপ্রসাদকে লিখেছিলাম । অনেক বছর আগে -----।"

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'চ্ছিল সুমিত্রার, কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে। কপাল ও হাতের চেটো ঘামে ভিজে উঠলো। পনেরো বছর ধরে তিলে

তিলে গড়া তাসের প্রাসাদ ওই একগোছা চিঠির ঘায়ে মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করে পঙ্কজের মুখখানা ভুলে থাকার চেষ্টা করে সুমিত্রা, কিন্তু সফল হয় না। শুধু এক অজানা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। ---- জানলার ধার থেকে সরে এলো মাধুরী। ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে সংক্ষেপে বললো, 'চলি।' তারপর সুমিত্রার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে সঙ্কুচিত ভাবে থেমে থেমে বললো, 'চিঠিগুলো ডাকেও পাঠানো যেতো কিন্তু মনে হ'ল হয়তো ঠিকমত পৌঁছবে না। কিংবা অন্য কারও হাতে পড়বে। আপনার কোন ক্ষতি হোক এ উনি কোনদিন চান নি ----।' তারপর বিষাদভরা দু'চোখ তুলে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললো, 'উনি গতমাসে মারা গেছেন।' মাধুরীর গাল বেয়ে অবাধ্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। ক্ষিপ্রহাতে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে স্খলিত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

সুমিত্রাকে লেখা ললিতের চিঠিগুলো ওয়ার্নবরা রোডের অ্যাটিকের ঘরে বসে একটি একটি করে কুচিয়েছিল সুমিত্রা। তারপর সবগুলো একত্র করে বাগানের বড় ডাস্টবিনটায় ফেলে এসেছিল ল্যাণ্ডলেডী মিসেস লেগেটের নজর বাঁচিয়ে। কিন্তু এ চিঠিগুলোকে কুচোনো যাবে না। পঙ্কজের চোখে পড়বে, চোখে পড়বে নুরের এবং আয়া, জমাদার ও মালীর। আগুনে পোড়াতে হ'বে এগুলো, তারপর কাগজপোড়া ছাইটাকে সরিয়ে ফেলতে হ'বে কোথাও, অতি সন্তর্পণে -----। ঘড়ি দেখলো সুমিত্রা। আরও ঘণ্টা তিনেক অবিচ্ছিন্ন একাকীত্ব। এর মধ্যে অনায়াসে সেরে ফেলা যায় এক যুগ আগের সেই খেলা খেলা প্রেমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

কিন্তু চিঠিগুলো সেদিন পোড়ায়নি সুমিত্রা। তার পরের দিনও না। কি এক সর্বনেশে নেশায় পেয়ে বসলো তাকে। সকাল আটটার মধ্যে পঙ্কজ ও নুর বেরিয়ে যায়। ঝিটাকে তাড়া দিয়ে যাহোক করে কাজ সারিয়ে বিদেয় করে। তারপর দরজায় খিল তুলে দিয়ে নির্জন দুপুর ভরে একটি একটি করে চিঠিগুলো পড়ে। চিঠি নয় যেন তরল আগুন গিলছে সে ----। এরপর একদিন সত্যিই চিঠির বাণ্ডিলে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরালো সুমি। গেরুয়া আগুন সাপের মত লক্‌লক্‌ করতে করতে একসময় ফুরিয়ে গেল। বাগানের একপাশে শুকনো পাতা জড়ো করে পুড়িয়ে গেছে মালি। সেই ছাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিল এ ছাইটাও।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি সবকিছু শেষ করা যায়? সেদিনকার সেই গেরুয়া আগুন সত্যিই কি নিভলো? তবে একটু একটু করে সুমিত্রার জীবন থেকে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল কেন? আর সুমিত্রা নিজে? নিজেকে খণ্ডিত করে একে অপরের সঙ্গে যেন যুঝে চলেছে অবিরত। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শুধু ----- অদৃশ্য, অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে প্রতিহত করতে পারেনি -----। এরই মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফধারী সোহনানন্দ স্বামী। অগুন্তি ব্রতপালনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে সুমিত্রা। তার আচার-বিচারের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সবাই। কিন্তু শান্তি ফিরে পায়নি সে।

চতুর্থ ডায়েরীর একটা এনট্রি :-

"পঙ্কজ কাল অফিসের কাজে হিণ্ডন গেছিল। বলেছিল ফিরতে অনেক রাত হ'বে ----। বোধহয় রাত্রি ন'টা তখন। খাওয়া দাওয়া সেরে নুর বেডলাইট জ্বেলে গল্পের বই পড়ছে -----"

বারান্দায় আলো নিভিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুমিত্রা। এ রাস্তাটায় এমনিতেই ভিড় কম, তখন যেন বড় বেশী নির্জন লাগছিল। একটা বড় ভ্যান এসে থামলো। পিছনের দরজা খুলে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে কি একটা নামাচ্ছিল।

"---- আমি যেন পরিষ্কার দেখলাম পঙ্কজ শুয়ে আছে, ওরা সবাই নামাচ্ছে ওকে। আমার চিৎকার শুনে নুর ছুটে এলো, ভ্যানের লোকগুলোও এগিয়ে এলো। তখন বুঝতে পারলাম ওটা ফার্নিচার কোম্পানীর গাড়ী। সামনের বাড়ির জন্যে সোফা-সেট এনেছে। সেটাই নামাচ্ছিল ধরাধরি করে। এখনও ভয়ে বুক কাঁপছে আমার ----।"

সবসময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সুমিত্রা। নিয়তি যেন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ওর সব কিছু ছিনিয়ে নিতে ---- ওর কৃতকর্মের মাশুল হিসেবে -----। কখন কিভাবে কি ঘটতে পারে ভেবে পায়না সুমিত্রা। শুধু ভাবে। পরীক্ষিৎ রাজার মত নতুন নতুন সাবধানতার পথ খোঁজে শুধু। সতর্ক প্রহরায় থাকে সর্বক্ষণ। ওর ঠাকুর ঘরে দেবদেবীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে পা টিপে টিপে উঠে নাইট্ লাইটের আবছা আলোয় অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকে স্বামী ও সন্তানের মুখের পানে। কি যেন খোঁজে ওদের ঘুমন্ত মুখে।

এক জায়গায় লেখা :-

" ---- মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মধ্যেই, আমারই এক অংশ যেন কান পেতে সেই চরম সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছে ----। সেই অনিবার্য শাস্তিটা আমারই নিজের তাগিদ যেন, আত্মার প্রার্থনা -----। নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি, জানি বিধাতাও আমায় ক্ষমা করবেন না -----। ভগবান, আমি যে পাগল হয়ে যাবো !"

এর পরের এনট্রি :-

"---- ফাঁসীর আসামীকে কয়েকটা দিনের জীবন দান করে তার নরক-যন্ত্রনা সহস্রগুণে বাড়িয়ে দেওয়া শুধু। অনিবার্যকে বাধা দেওয়ার নিস্ফল চেষ্টা আর নয়। ---- পঙ্কজ, তুমি আরও আগে এলে না কেন! ওদের সবার আগে!!"

এর পরের পাতাগুলো সাদা।

ডায়েরীগুলো টেবিলে রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা উঠে গেল যেন। সুমির অদ্ভুত পরিবর্তনের কারণটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ললিতপ্রসাদ যে সুমিকে ভুলতে পারেনি একথা আমি এত বছর ধরে জানলেও সুমিকে কোনদিন আভাসমাত্র দিইনি। ললিতপ্রসাদের মেয়ে যে আমার কন্যাসমা এবং ক'বছর আমার সঙ্গে একই ঘরে কাটিয়েছে এ খবরও ঘুণাক্ষরেও জানাইনি ওকে। ভেবেছিলাম স্মৃতির কবর খুঁড়ে মৃত অতীতকে জাগানোর চেষ্টায় অযথা রক্তক্ষরণই হ'বে শুধু, কারো কোনও মঙ্গল হ'বে না তাতে। একথা ভাবিনি যে শুধু মৃতকেই কবর দেওয়া চলে। যে অতীত মরেনি তাকে মাটি চাপা দিয়ে নিঃশেষ করা যায় না। অশ্বত্থের বীজের মত সবার অলক্ষ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে শিকড় ছড়িয়ে দেয় সে। তারপর পাষাণ-সমাধির বাঁধন ভেঙে ডালপালার সহস্র বাহু মেলে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ায় যেদিন সেদিন আর তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা থাকে না কারও ----।

কতক্ষণ অভিভূতের মত বসে ছিলাম খেয়াল নেই। দূরে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজলো। পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করলাম। অপর প্রান্তে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ বেজে উঠলো। ওরা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। ফোন তুলে যখন ব্যস্ত হয়ে

জানতে চাইবে কি অঘটন ঘটেছে যার জন্যে এই অপার্থিব সময়ে ওদের ঘুম ভাঙালাম কি জবাব দেবো? খুব সম্ভব পঙ্কজই ফোন ধরবে। বলবো কি ওর স্ত্রীর ভুল করে ফেলে যাওয়া প্যাকেটটা খুলে তার ডায়েরীগুলো আঁতি-পাঁতি করে পড়ে ফেলেছি আমি এবং তাকে কতকগুলো একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই? আর যদি সুমি ফোন ধরে? তাকেই বা কি বলার আছে আমার? তাড়াতাড়ি রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ভাগ্যিস ওদের ঘুম ভাঙেনি ! অথবা, এতক্ষণে ঘুম ভেঙে থাকলেও, ভাগ্যিস ওরা জানবে না যে রাত তিনটের সময় ফোন করার দুর্বুদ্ধিটুকু কার হয়েছিল !

(১৩)

পরের দিন ইউনিভার্সিটিতে কাজ সারতে পাঁচটা বেজে গেল। ঘরে এসে বইপত্তর রেখে তখনি বেরিয়ে পড়লাম। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম।

সুমিদের বাড়ির দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। বুঝলাম বাড়িতে কেউ নেই। এতদূর এসে দেখা হ'ল না বলে মন খারাপ লাগছিল। বৃথা জেনেও সজোরে ঘণ্টার সুইচটা টিপলাম। পাশের বাড়ির জানলা থেকে এক ভদ্রলোক আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। এবার বেরিয়ে আমার কাছে এলেন।

বিষন্ন মুখে বললেন, "এদের বাড়ি কেউ নেই এখন। কাল একটা ট্র্যাজেডী ঘটে গেছে এখানে।"

বুকটা কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়, "সে কি? কি হয়েছে?"

"মিসেস চৌধুরী ঘরে দরজা বন্ধ করে পুজো করছিলেন। শাড়িতে প্রদীপের আগুন লেগে যায়। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লোকজন মিলে যখন আগুন নেভালো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শী ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ব্রট ডেড -----।"